প্রস্তর (অসমিয়া গল্প অনুবাদে)

মূল ঃ অর্পণ শইকীয়া - অনুবাদ ঃ বিবেকানন্দ চৌধুরী

'মানুষটা শীর্ণকায়, অতিশয় শীর্ণকায়।' আমার স্ত্রী নীলা আমাকে আগন্তুক সম্পর্কে একটা আভাস দিতে চেষ্টা করল, 'আমাদের হাজারিকারই মতন; তবে একটু লম্বা; মনে হয় তোমার চেয়েও একটু লম্বা হবে। সামনের দাঁতগুলো একটু বাইরে বেরিয়ে আসা, আর উপরের দাঁত দুটো মধ্যে ফাঁক আছে।'

'নাহ, আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না।' চুপচাপ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার মৌনতাতে সে হয়তো টের পেয়েছে যে আমি কিছু কুলকিনারা পাইনি; ওর বর্ণনা মাফিক কোনও চেনা মানুষ অথবা বন্ধুর কথা মনে আনতে পারিনি।

'একদম অপরিচ্ছন্ন, বুঝেছ! একটা পুরনো বস্তার মতন জ্যাকেট পরেছিল। লোকটার সঙ্গে সেটা মিলে গিয়েছিল। মানুষটার গায়ের রঙও জ্যাকেটটার মতনই হবে।' একটু জিরিয়ে নীলা আবার বলল, 'কথা বলতে একটু তোতলায়। তোমার নাকি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু; ইউনিভার্সিটিতে একসঙ্গে পড়ছিল। প্রায় দেড় দশক তোমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই।'

'দেড় শতক মানে পনের বছর! আমি যেন অতীতের অতলে তলিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। পনের বছর মানে... আমি তো তখন জালুকবাড়িতে। বিপিন, কৃষ্ণ, পবিত্র... বিনন্দ! ওদেরই কি কেউ নাকি? নীলাকে শুধোলাম, 'নামধাম কিছু বলেছিল কি?'

নীলা একটু থমকে গেল। এরপর কিছু একটা ভেবে বলল, 'এই যা ভুলে গেলাম। কী যেন কী যেন, করে মাথাটা একটু চুলকে বলল—'হ্যাঁ বদন না ভবেন এরকম কিছু একটা বলছিল বোধহয়। দাঁড়াও, তোমার জন্য একটা চিঠি লিখে গিয়েছে'—এই বলে নীলা বুমনের পড়ার টেবিল, ড্রয়ার ইত্যাদিতে চিঠিটা খুঁজতে লাগল।

'পাচ্ছি না যে! বুমনকে রাখতে বলেছিলাম, কোথায় যে রাখল'! নীলা মুখের ভেতরেই বিড়বিড় করে ড্রেসিং টেবিল, বিছানার বালিশের নিচে সর্বত্র চিঠিটা খুঁজতে লাগল। 'তোমার জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরে চিঠি একটা লিখে রেখে— এইমাত্র তুমি আসার একটু আগে চলে গেল। তুমি আবার আজই অফিসে দেরি করলে! সে নাকি যোরহাট যাবে। সরকারি বাসটা খারাপ হয়েছিল; সারাতে নাকি কিছু সময় লাগবে; তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে ঢুকেছিল। অনেকদিন হল তোমাকে নাকি দেখেনি।' নীলা চিঠিটা খুঁজতে খুঁজতে বলে চলল। তারপর হতাশ হয়ে বলল, 'না, পেলাম না। বমুন এলে তবে হবে।'

'আচ্ছা, বমু গেল কোথায়?'

'ইস্কুল থেকে ফিরেই খেলতে গেল। এখনই আর কোথায় আসবে। আসতে আসতে সন্ধে হয়ে যাবে।'

আজ আপিস থেকে বেরোতেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর আবার রাস্তায় মোটর সাইকেলের হর্নটা কাজ করছিল না। পুরনো গাড়ি! আপিস ছুটির টাইমে রাস্তা গাড়ি, মানুষ, রিক্শা, সাইকেলে ঠাসা তাকে। এমনিতেই খুব সাবধানে মোটর সাইকেল চালিয়ে আসতে হয়, তাও আবার হর্নটা না বাজার জন্য আরও বেশি আস্তে চালাতে হল।

গেট খুলে মোটর সাইকেলটা ঠেলে এই সবে ভেতরে ঢুকছি, নীলা একটা উৎকণ্ঠিত হয়ে দৌড়ে আসার মতো বেরিয়ে এল— 'এত দেরি হল যে? বাইকটা কিছু গণ্ডগোল করেনি তো?'

'না, না তেমন কিচ্ছু না। মাঝখানে পুলিশ পয়েন্টের কাছে হর্নটা অকেজো হয়ে গেল। রাস্তায় যা ভিড়। তার ওপর আবার অপিস থেকে বেরোতে দেরি। গুয়াহাটির হেড আপিসে থেকে লোক এসেছিল।

নীলা বলল, 'তোমাকে খুঁজতে একজন লোক এসেছিল। একটু আগেই চলে গেল।'

একটু পরে নীলা আর আমি চা - খেতে বসলাম। সূর্য অস্তাচলে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে দিনের শেষের রোদ গলে টেবিলে এসে পড়ছে।

আমি মনের ভেতর নীলার বর্ণনার মানুষটাকে খুঁজতে থাকলাম। উহঁ, ওই নামের তো কোনও বন্ধুর কথা মনে পড়ছেনা। ভবেন বরা বা বরুয়া নাকি বদন...। না, ওইরকম নামের কাউকেতো মনে পড়ছে না। বিপিন, কৃষ্ণ, মুকুল কিংবা খালেকদের কি কেউ নাকি? না কি পবিত্র? পনের বছর আগে ওরাই তো আমাদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুবর্গ ছিল। কিন্তু নীলা তো ওরকম নাম বলল না! আচ্ছা, বিপিন হতে পারে? বিপিনের মুখটা মনের পর্দায় ভেসে উঠল। জালুকবাড়িতে আমরা দুজন খুব বন্ধু ছিলাম। আমাদের কথাবার্তা, শখ (এমনকি দুজন একই সঙ্গে একই মেয়ের প্রেমে পড়ছিলাম) একই রকমের ছিল। ও এসেছিল কি? 'লোকটা কি চশমা, মানে মোটা ফ্রেমের চশমা পড়েছিল?' —আমি নীলাকে শুধোয়।

'না, না; লোকটা চশমা পরে না।'

বিপিল কলেজে চশমা পরত। তার মানে বিপিন নয়। তার ওপর এর চেহারা ছিল সুন্দর, সুগঠিত। ইউনিভারসিটির মেয়েদের কাছেও সে জনপ্রিয় ছিল।

অবশেষে বিপিন নয় বলে নিশ্চিত হলাম। কোথায় আছে সে জানি না। প্রায় পনের বছর হল তাকে দেখিনি। এর মধ্যে অবশ্য ওর বিয়ের চিঠিটা পেয়েছিলাম।

'অত চিন্তা করার কী আছে? নীলা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল 'লোকটা কিন্তু খুব অগোছালো, পরনের জ্যাকেটটা যে আরও কত পুরনো, দেখলেই ধরা যায়। জুতোজোড়াও দেখবার মতো। ওটা মনে হয় কোনওদিন পালিশের মুখ দেখেনি আর একটা কথা, লোকটা অনবরত সিগারেট টানছিল।

'চা-টা দিয়েছ?'

''বয়ে গেছে। কোথাকার লোক। এরবার এমনিই বলেছিলাম, চা খাবে কিনা? ও বলল, খাবে না। জোর করলাম না। এদিকে বমনও ঘরে ছিল না, একা ছিলাম। ঠিক লাগছিল না। মনে হচ্ছিল গেলেই যেন বাঁচি। ও কিন্তু বহুক্ষণ বসে রইল। একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকছিল। সারা ঘর ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল। বার বার ঘড়ি দেখে আর বলে 'এহেঃ অপু তো এল না। দেখা হলে ভাল লাগত।' তোমাকে ঘরের নাম ধরে ডাকছিল। নিশ্চয়ই তোমার কোনও খুব কাছের বন্ধু।'

আমি ভাবনায় পড়লাম। আমাকে কে অপু বলে ডাকে। সবাই তো আমাকে পোষাকি নাম দিয়েই ডাকত মনে করতে পারছিলাম। না।

নীলা আবার বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলল, 'দেখতো কিরকম অপরিচ্ছন্ন লোক। সিগারেটের টুকরো, ছাই দিয়ে সারা ড্রইংরুমের মেঝেটা ভরিয়ে ফেলেছে। এর মধ্যে একবার আমার কাছে একটা অ্যাশট্রে চেয়েছিল। আমি আর কী বলব, নেই বলে দিলাম। তোমার দামি অ্যাশট্রেটা দেবার ইচ্ছা হল না।'

আমি চুপচাপ স্মৃতি উদ্ধার করার চেষ্টা করছিলাম শীর্ণকায়, একটু বেরিয়ে আসা দাঁত, আগের দাঁত দুটোর মধ্যিখানে একটু ফাঁকা, কথা বলতে তোতলায়, কে সে?

আমার ঘর ট্র্যান্সপোর্ট স্টেশনের চৌহদ্দির ওদিকেই। কখনও দু-একজন পুরনো বন্ধু এইদিকে কোথাও এলে এমনিই দেখা করে যায়; কিন্তু এরকম করে আমাকে দেখা করার জন্য দেড়ঘন্টা বসল, নিজের ঘরের ড্রইংরুমের মতই সিগ্রেটের ছাইগুলো বিনা দ্বিধায় ফেলে রেখে গেল— কে হতে পারে? মনে তো কারও নাম আসছে না। নীলার বলা কথাগুলোর সঙ্গে মিলে —কা কোনও বন্ধুকেই মনে পড়ে না। নীলার বলা শীর্ণ লোকটা পনের বছর আগে বা কিরকম ছিল। হয়তো সে মোটাই ছিল। সঞ্জীব নাকি? মস্ত মোটা লাল টুকটুকে ছেলেটা কিজানি এখন শীর্ণকায় হয়ে গেছে। তার সঙ্গে তো মার সদ্ভাব ছিল। আচ্ছা সে আমাকে কী নামে ডাকত? অত মনে নেই। আমিওতো কত বদলে গেছি। কলেজে থাকতে আমি যথেষ্ট রোগা ছিলাম; এখনতো যথেষ্ট মোটা হয়ে গেছি। চুলগুলোও অনেকটা পেকেছে। চশমাও নিলাম। আমাকে হয়তে বিপিন, কৃষ্ণরা এখন চিনতেই পারবে না। আগে তো (ছাত্রাবস্থায়) হস্টেলে কে কার কাপড় (গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া পর্যন্ত) পরত তার কোনও পাত্তা ছিল না। আমিও আগে সিগরেট খেতাম। বিয়ের পরে একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। কদাচিত কখনও অনুষ্ঠানে নয়তো পুরনো বন্ধুর সঙ্গে খুব বেশি দু-একটা টানি। বিয়ের ঠিক পরেই আমি নীলাকে নিয়ে দক্ষিণ ভারত বেড়াতে গিয়েছিলাম। মহীশূরে চন্দন কাঠের বানানো ছোট্ট সুন্দর একটা অ্যাশট্রে কিনেছিলাম। উড়ে লাফ মারার ভঙ্গিতে একটা পাখি; তার চোখ দুটোতে কাচের ছোটো লাল মণি লাগানো। ডানা দুটো হাতির হাঁতের। অ্যাশট্রেটা কখনও ব্যবহারই হয়নি। সেটা টিভির উপরে পুতুলের মতো সাজিয়ে রেখেছি। দেখলে ছাইদানি বলে ধরাই যায় না। হাতে তুলে নিয়ে ভাল করে লক্ষ করলে তবেই বোঝা যায় যে সেটা অ্যাশট্রে। কখনও আমার কোনও বন্ধু এলে ব্যাবহার করতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু নীলা তা হতে দেয় না। বমুন মাঝে মাঝে সেটাকে নাকের কাছে নিয়ে চন্দন কাঠের ঘ্রাণ নেয়।

মেঝের দিকে তাকালাম। সিগরেটের বেশ কয়েকটা টুকরো সেখানে পড়ে আছে। আর ছাইগুলোও ধুলার মতো হয়ে মেঝেটা নোংরা করছে।

নীলা বলল 'লোকটা নাকি তেমার বিয়ের কথাও জানে না। তুমি নাকি খবরই দাওনি।'

নীলা আবার শুরু করল— এরপর 'কখন বিয়ে হল, বমুনের বয়স কত হল, সব খবর নিল। আমি একবার সে কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করতে বলল, গুয়াহাটিতে। জু' রোডে বাড়ি বানিয়েছে। ওর-ও বুমনের সমান একটা মেয়ে আছে।'

একটু পরেই বমুন এল। ঘরে ঢুকেই সে বাথরুমে চলে গেল। আমি আর নীলা চায়ের টেবিলে অপেক্ষা করছি। আমি যেন অধৈর্য হয়ে উঠলাম। নীলা আমার চাপা অস্বস্তিটা বুঝল। সে বুমনকে জোড়ে ডাক দিল— 'বুমন, বুমন, তখনকার চিঠিটা—'

বুমন বাথরুম থেকেই সাড়া দিল—'পড়ার টেবিলের একটা বই খুলে তার ভেতর থেকে সাদা কাগজে লেখা একটা চিঠি তার মা-র হাতে তুলে দিল। আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। রহস্যের আবর্ত খুলবে এখন।

নীলা চিঠিটা খুলে আমার সামনে পড়তে শুরু করল—

স্নেহের অপু,

তোকে দেখতে এসেছিলাম, পার্টনার। অনেক দিন হল তোকে দেখিনি। দেখা হলে খুব ভাল লাগত। তোর স্ত্রী আর ছেলের সঙ্গে পরিচয় হল। যোরহাট যাচ্ছি। বাসটা একটু খারাপ হয়েছিল। মেকানিক বললে সারাতে খানিক সময় লাগবে। ভাবলাম তোর ঘরেই একটা ঢুঁ মেরে যাই।

ইতি তোর কানু (বুধীন বরুয়া)। নামটা বলেই নীলা আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকল কিছু একটা উত্তরের প্রত্যাশায়। নামটা যেন আমার হৃদয়ে শিহরন তুলল। আমি হয়তো একটু উত্তেজিতও হয়ে পড়েছিলাম। নীলাকে বললাম 'বুঝতে পেরেছ কে এসেছিল? বুধীন বরুয়া, আমার কলেজের পার্টনার। ইস্ ওর নামটা তো একবারও মনে আসেনি।'

নীলা বলল 'বুধীন বরুয়া— মানে কোন বুধীন বরুয়ার কথা বলছ?'

'লেখক বুধীন বরুয়া— অদ্ভুত অদ্ভুত গল্পগুলো লেখে যে।'

'ওহ, সেই বুধীন বরুয়া?' নীলা চোখ বড় বড় করল।

'হ্যাঁ। গতবার যে অকাডেমি পুরস্কার পেয়েছে। টিভিতে সিরিয়ালও করছে, বিখ্যাত লেখক বুধীন বরুয়া। আমার অতি পুরনো বন্ধু।' আমি একনাগাড়ে বলে গেলাম।

'ইস ইস। ও তো বলতে পারতো। কিরকম আজব মানুষ, দ্যাখো তো।' নীলার কণ্ঠে আক্ষেপ স্পষ্ট।

'কী আর বলবে। ও তো নামটা বলেছেই। নিজে কি আর এখানে লেখক বলে পরিচয় দেবে?' আমি নীলাকে মৃদু ভর্ৎসনা করলাম। তারপরে বললাম— 'দেখেছ, ওর নামটাওতো আমি তখন মনে করতে পারিনি। জান— ও বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছেলে ছিল। ফুটবলও খেলত। কিন্তু ওর তো সিগরেটের নেশা ছিল না। কে জানে কখন থেকে কেন সিগরেটের নেশায় পেয়ে গেল।' আমি স্বগতোক্তি করার মতো বলে গেলাম, 'কলেজের দিন থেকে সে লিখতে শুরু করছিল। ইস্, কতকাল হয়ে গেল—ওর সঙ্গে দেখা হল না! তুমি ওকে এক কাপ চা খেতেও বললে না?'

নীলা হতবাক হয়ে গেল। একটু লজ্জিতও হল বোধহয়।

একটু পরে কলিংবেল বাজল। বমুন দরজা খুলল আর ভেতরের দিকে মুখ বাড়িয়ে উচ্চৈস্বরে বলল— 'বাবা! শর্মা কাকু, কাকিমা এসেছেন।'

আমি আর নীলা চায়ের টেবিল থেকে উঠে পড়ি। শর্মারা আমাদের পাশের বাড়ি। গত মাসে বিয়ে হয়েছে। শর্মাকে দেখে নীলা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত সুরে বলতে শুরু করল। 'আজ জানেন, আমদের ঘরে বুধীন বরুয়া এসেছিল।'

নব পরিণীতা দম্পতি আমাদের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি রাখল।

নীলা তাদের আমাদের ঘরে পদার্পণ করে যাওয়া সেই বিশেষ লোকটার বিষয়ে বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তখনকার শীর্ণকায়, অপরিচ্ছন্ন, দাঁত বেরনো মানুষটার বর্ণনাগুলো পালটে গেছে। 'আরে ওই যে বিখ্যাত লেখক, গতবার যিনি অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন! সেই বুধীন বরুয়া, কবিতার মতো অদ্ভুত গল্পগুলো লেখেন যে!' যেন সাধারণ কালো প্রস্তর একটুকরোর অনাবশ্যক অংশগুলো বাইরে থেকে ছাড়িয়ে ফেলে তার নীচে অদ্যাপি লুকিয়ে থাকা অসাধারণ প্রতিমূর্তিটাকে প্রাণবন্ত করে তোলার প্রয়াস।

শর্মা দম্পতিকে কথাগুলো বলার পরেই নীলার মনে হল—'মেঝের, অন্তত সিগরেটের টুকরোকটা সরিয়ে ফেলা উচিত।' কিন্তু অতিথি বসা অবস্থায় ঝাড়ু দেওয়াটা সমীচীন হবে না বলে মুহূর্তে তড়িঘড়ি করেই সে সিগরেটের টুকরোগুলো আলতোভাবে হাতে তুলে নিলে এবং এক মুহূর্ত অপ্রস্তুত হয়ে কী করব... ভাবতে ভাবতে সেগুলো চন্দন কাঠের অ্যাশট্রেটাতে গুঁজে দিল।